

রেমিট্যান্সের উল্লেখ: অর্থনীতিতে আস্থা ফেরার বার্তা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু ইতিবাচক সূচক দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে সন্তোষজনক খবরটি এসেছে প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রে। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের শুরু থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ৮ দশমিক ৭৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৭ দশমিক ৬৪৩ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে একই সময়ে রেমিট্যান্স বেড়েছে ১৫ দশমিক ১ শতাংশ।

সংখ্যাটি বড়। কিন্তু এর তাৎপর্য শুধু ১৫ দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় এর রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে। বিশেষ করে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এবং তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর অর্থনীতির গতিপথ নিয়ে যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, রেমিট্যান্সের এই প্রবৃদ্ধিকে সেই বৃহত্তর প্রেক্ষাপট থেকেও দেখার প্রশ্ন রয়েছে।

আরো বিস্ময়কর একটি পরিসংখ্যান রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, ১ থেকে ৩ অক্টোবর-মাত্র তিন দিনে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ২০৬ মিলিয়ন ডলার। গত বছরের একই তিন দিনে এসেছিল মাত্র ৫৭ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ একই সময়ের তুলনায় প্রায় সাড়ে তিন গুণও বেশি হয়েছে। মাত্র তিন দিনের হিসাব দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা নির্ধারণ করা অবশ্যই ঠিক হবে না, কিন্তু অর্থবছরের প্রথম তিন মাসের বেশি সময়ের

১৫ দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে এই তথ্য মিলিয়ে দেখলে একটি ইতিবাচক ধারার উপস্থিতি অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন রেমিট্যান্স বাড়ছে? রেমিট্যান্সের প্রবাহ কখনো একটি মাত্র কারণে বাড়ে না। বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীর সংখ্যা, তাদের আয়, বিনিময় হার, ব্যাংকিং ব্যবস্থার দক্ষতা, হুন্ডির সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলের প্রতিযোগিতা, সরকারি প্রণোদনা এবং দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি—সবকিছুই এতে ভূমিকা রাখে। ফলে পুরো কৃতিত্ব কোনো একটি সরকার বা একটি সিদ্ধান্তকে দিয়ে দিলে বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

তার পরও সরকার পরিবর্তনের পর যদি ধারাবাহিকভাবে বৈধ পথে রেমিট্যান্স বাড়তে থাকে, তাহলে সরকারের ভূমিকার প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়াও বাস্তবসম্মত নয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি অদৃশ্য কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে আস্থা। একজন প্রবাসী যখন ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে অর্থ পাঠান, তখন শুধু পরিবারকে টাকা পাঠান না; দেশের আর্থিক ব্যবস্থার ওপরও এক ধরনের আস্থা প্রকাশ করেন। এখানেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন সরকারের সামনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি ছিল মানুষের আস্থা শক্তিশালী করা। দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপড়েন, বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ, মূল্যস্ফীতি এবং ব্যাংকিং খাত নিয়ে উদ্বেগের পর দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীলতার দিকে নেওয়া সহজ কাজ নয়। এমন পরিস্থিতিতে অর্থবছরের শুরুতেই রেমিট্যান্সে দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে সরকারের জন্য স্বস্তির খবর।

তবে এই সাফল্যের সবচেয়ে বড় অংশীদার অবশ্যই বাংলাদেশের প্রবাসীরা। মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কঠোর পরিশ্রম করে তারা যে অর্থ দেশে পাঠাচ্ছেন, সেটিই বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম

প্রধান উৎস। রপ্তানি আয়ের পাশাপাশি রেমিট্যান্স আমাদের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা, আমদানি ব্যয় মেটানো এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করার অন্যতম ভিত্তি।

রিজার্ভের হিসাবটিও তাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ২৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের গ্রস বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল প্রায় ৩৬ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলার। আর আগে ২০ সেপ্টেম্বর তা ছিল প্রায় ৩৬ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার। একই সময়ে আইএমএফের বিপিএম-৬ পদ্ধতিতেও রিজার্ভ ছিল ৩১ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলার।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার রাখা দরকার—গ্রস রিজার্ভ আর বিপিএম-৬ অনুযায়ী হিসাব করা রিজার্ভ এক জিনিস নয়। সাধারণ মানুষের কাছে বড় সংখ্যাটি আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, কিন্তু অর্থনীতির প্রকৃত সক্ষমতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হিসাবটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। একটি দায়িত্বশীল সরকারকে তাই রিজার্ভের পরিমাণ নিয়ে আত্মতুষ্ট না হয়ে দেখতে হবে এই রিজার্ভ কতটা টেকসই এবং আমদানি ও বৈদেশিক দায় মেটানোর ক্ষেত্রে কতটা স্বস্তি দিচ্ছে। আর এখানেই রেমিট্যান্স বৃদ্ধির গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়।

রেমিট্যান্স এমন বৈদেশিক মুদ্রা, যার বিপরীতে রাষ্ট্রকে ঋণ পরিশোধ করতে হয় না। বিদেশি ঋণ এলে তার সুদ ও আসল ফেরত দিতে হয়। কিন্তু একজন প্রবাসী তার পরিবারের কাছে ১ হাজার ডলার পাঠালে সেই বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অর্থনীতিতে সরাসরি যুক্ত হয়। সে কারণে রেমিট্যান্স বৃদ্ধিকে রিজার্ভ শক্তিশালী করার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর উপায়গুলোর একটি হিসেবে দেখা যায়।

সেপ্টেম্বরের তথ্যও এই প্রবণতার পক্ষে কথা বলে। মাসটির প্রথম ২০ দিনেই দেশে এসেছে ১৪৭ কোটি ৭০ লাখ ডলার। শুধু ১৭ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর—এই তিন দিনেই

প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ১৩ কোটি ডলার। আগের বছরের সেপ্টেম্বরের প্রথম ১৯ দিনে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৩৬ কোটি ৯০ লাখ ডলার। অর্থাৎ প্রবাহের গতি যে শক্তিশালী রয়েছে, বিভিন্ন সময়সীমার তথ্যও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

তবে বিএনপি সরকারের সামনে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে—এই ইতিবাচক প্রবণতাকে রাজনৈতিক প্রচারের উপাদানে সীমাবদ্ধ না রেখে টেকসই অর্থনৈতিক অর্জনে রূপান্তর করা। কারণ রেমিট্যান্স বাড়লেই অর্থনীতির সব সমস্যা শেষ হয়ে যায় না। মূল্যস্ফীতি যদি সাধারণ মানুষের আয় খেয়ে ফেলে, কর্মসংস্থান যদি প্রত্যাশিত হারে না বাড়ে, ব্যাংকিং খাতে দুর্বলতা থেকে যায় কিংবা বিনিয়োগ না বাড়ে; তাহলে শুধু রেমিট্যান্স দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বরং বর্তমান প্রবৃদ্ধিকে একটি সুযোগ হিসেবে দেখতে হবে।

প্রথমত, বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পাঠানো আরো সহজ, দ্রুত ও সাশ্রয়ী করতে হবে। দ্বিতীয়ত, হুন্ডির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে, তবে শুধু অভিযান দিয়ে নয়। হুন্ডি কেন আকর্ষণীয় হয়, সেই অর্থনৈতিক কারণগুলোও দূর করতে হবে। ব্যাংকের বিনিময় হার যদি বাস্তবতার কাছাকাছি থাকে এবং অর্থ দ্রুত ও ঝামেলাহীনভাবে পরিবারের কাছে পৌঁছায়, তাহলে বৈধপথ স্বাভাবিকভাবেই বেশি আকর্ষণীয় হবে।

তৃতীয়ত, প্রবাসীদের শুধু বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর উৎস হিসেবে দেখার পুরোনো মানসিকতা বদলাতে হবে। তারা বাংলাদেশের অর্থনীতির অংশীদার। বিমানবন্দরের শুরু থেকে শুরু করে দূতাবাস, পাসপোর্ট, কর্মসংস্থান চুক্তি এবং দেশে বিনিয়োগ—প্রতিটি পর্যায়ে তাদের সম্মান ও সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

চতুর্থত, রেমিট্যান্সের একটি বড় অংশ যেন শুধু ভোগে সীমাবদ্ধ না থেকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে যায়, সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রবাসীদের জন্য বন্ড, আবাসন ও

শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ বাড়ানো গেলে রেমিট্যান্স অর্থনীতিতে বহুমুখী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

এখানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারের সামনে একটি বড় রাজনৈতিক সুযোগও রয়েছে। বিএনপি যদি দেখাতে পারে যে, তাদের শাসনামলে প্রবাসীদের আস্থা বেড়েছে, বৈধপথে অর্থপ্রবাহ বেড়েছে, রিজার্ভ শক্তিশালী হয়েছে এবং একই সঙ্গে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিবেশও উন্নত হচ্ছে; তাহলে সেটি শুধু একটি অর্থনৈতিক অর্জন থাকবে না; সরকারের প্রতি মানুষের আস্থারও একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হয়ে উঠবে। কিন্তু কৃতিত্ব দাবি করার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় বজুতা নয়; ধারাবাহিক ফলাফল।

তিন মাসে ১৫ দশমিক ১ শতাংশ রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু এক বছর পর যদি একই ইতিবাচক ধারা বজায় থাকে, রিজার্ভ আরো শক্তিশালী হয়, ডলারের বাজার স্থিতিশীল থাকে এবং মূল্যস্ফীতিও নিয়ন্ত্রণে আসে, তখনই বলা যাবে অর্থনীতিতে সত্যি কার অর্থে একটি নতুন ধারা তৈরি হয়েছে। বর্তমান পরিসংখ্যান সেই সম্ভাবনার একটি প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আরেকটি বিষয় ভুলে গেলে চলবে না। এই ৮ দশমিক ৭৯৮ বিলিয়ন ডলারের পেছনে আছে লাখ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশির শ্রম, ঘাম এবং ত্যাগ। কেউ মধ্যপ্রাচ্যের প্রচণ্ড গরমে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন, কেউ ইউরোপে দীর্ঘ সময় কাজ করছেন, কেউ চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী বা পেশাজীবী হিসেবে আয় করছেন। তাদের পাঠানো ডলার শুধু বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ায় না; বাংলাদেশের অসংখ্য পরিবারের খাবার, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাড়ির ও ভবিষ্যতের স্বপ্নও বহন করে।

তাই রেমিট্যান্সের এই উল্লেখ্যে সরকারের কৃতিত্ব থাকলে সেটি স্বীকার করতে হবে, আবার প্রবাসীদের অবদানকেও সবার ওপরে রাখতে হবে।

তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের জন্য সবচেয়ে ভালো পথ হবে এই অর্জনকে নিয়ে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে এর ভিত আরো শক্ত করা। কারণ অর্থনীতিতে আস্থা তৈরি করতে সময় লাগে, কিন্তু সেই আস্থা নষ্ট হতে সময় লাগে না।

বাংলাদেশের সামনে এখন সুযোগ এসেছে রেমিট্যান্সের এই ইতিবাচক প্রবাহকে রিজার্ভ শক্তি, বিনিয়োগের শক্তি এবং শেষ পর্যন্ত উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের শক্তিতে রূপান্তর করার। ১৫ দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি তাই কেবল একটি সংখ্যা নয়। এটি প্রবাসীদের বাংলাদেশের প্রতি আস্থার প্রকাশ, অর্থনীতির জন্য স্বস্তির বার্তা এবং একই সঙ্গে নতুন সরকারের জন্য একটি পরীক্ষা—এই অনুকূল ধারাকে তারা কতটা দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে। সেই পরীক্ষায় সফল হতে পারলেই আজকের রেমিট্যান্সের উল্লেখ্য আগামী দিনের বৃহত্তর অর্থনৈতিক ঘুরে দাঁড়ানোর সূচনা হিসেবে ইতিহাসে জায়গা নিতে পারে।

লেখক: সিরাজুল ইসলাম, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক